ইউনিট ৪

ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্বব্যবস্থা

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন অনুরূপভাবে প্রয়োজন অর্থের। এ অর্থ ব্যক্তি পরিবার যে কোন সংগঠন, সংস্থা এবং রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন।

মানুষ যে সব সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে জীবন-যাপন করে তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোই সবচেয়ে বড়। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে কোন মানুষের অবস্থান নেই বললেই চলে। তাই জনগণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বও অনেক বেশী। জনসাধারণকে অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়া, তাদেরকে ক্ষুধা-দরিদ্রতার যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়া, পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ও অপুষ্টি হতে মুক্তি দেয়া, আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষিত করে তোলা, সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা একটা আদর্শ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।

এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার। যুগে যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ যেমন, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বার বার চেষ্টা করেও জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ফলে একথা আজ প্রমাণিত যে, ইসলামী অর্থনীতিই ভারসাম্যপূর্ণ একটি অর্থনীতি। একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের এ মহান দায়িত্ব পালন করতে অর্থের প্রয়োজন। আর এ অর্থ যোগান দেয়ার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তারই নাম রাজস্বব্যবস্থা। আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক চেষ্টিবলের ভাষায় "রাজস্ব বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের সেই অর্থকে বুঝায়, যা সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়। ইসলামী আইনেও রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থা কেমন হবে তার একটা মূলনীতি রয়েছে। এ ইউনিটে রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটকে নিম্নলিখিত পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে:

- ❖ পাঠ-১: ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ
- ❖ পাঠ-২: ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ
- ❖ পাঠ-৩: ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব
- ❖ পাঠ-৪: ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাতব্যবস্থা
- ❖ পাঠ-৫: ইসলামী রাষ্ট্রের করব্যবস্থা

পাঠ ঃ ১

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য ঃ

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের মূলনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- কোন কোন খাত থেকে সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের আয় হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যাকাত, ওশর, খারাজ-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাকাত, ওশর ও খারাজ-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় আয়

রাষ্ট্র হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি ভূখন্ডের জনসমষ্টিকে সুশৃংখল ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য বৃহৎ একটি সংগঠনের নাম। রাষ্ট্র নামক এ সংগঠনটি তার উপর অর্পিত জনসাধারণের নানা দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য তার অনেক অর্থের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনসাধারণ ও অন্যান্য খাত হতে যে অর্থ আদায় করা হয় তা-ই রাষ্ট্রীয় আয়।

রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রয়োজনীয়তা

একজন ব্যক্তির নিজের জীবনযাত্রা সুষ্ঠুরূপে নির্বাহ করার জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হয়। একটি পরিবার পরিচালনার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে একটি সরকারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও দায়িত্ব পালনের জন্যও অর্থ সম্পদের প্রয়োজন। ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক চাহিদা পুরণের জন্য যেমনিভাবে নিজস্ব উপায় পন্থা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রও দেশবাসীর নিকট হতে বিভিন্ন কর আদায় করে থাকে। দেশের অন্যান্য সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে।

রাষ্ট্রীয় আয়ের মূলনীতি

কুরআন ও হাদীসে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে আয়ের মূলনীতি কি হবে তা যেমন বলে দেয়া হয়েছে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের আয়ের ব্যাপারেও সরকারকে কি কাজ করতে হবে তার মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন-

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى ٱلأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلواَةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَواةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ.

'' আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করলে তারা সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।'' (সূরা আল-হাজ্জ : ৪১)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্র বা সরকারকে চার ধরনের কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট খাতের ব্যয় মেটানো সম্ভব।
রাসূলুল্লাহ (স.) ইসলামী রাষ্ট্রের আয়-ব্যায় এর মূলনীতি বর্ণনা করত গিয়ে বলেন-

تؤخذ من أغنياءهم فترد إلى فقراءهم.

"তুমি তাদের (ধনীদের) থেকে যাকাত আদায় করবে এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে।" (বুখারী)

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম রাষ্ট্রকে আয় করার অধিকার প্রদান করেছে।

ব্যয়কে স্থায়ী নৈতিক নিয়মে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ নীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে কারও উপর কোন প্রকার জুলুম করা যাবে না। রাজস্ব আদায় করতে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) -এর একটি বক্তব্যে উক্ত মূলনীতির প্রকাশ পায়। তিনি বলেন-

و إنى لا آخذ هذا المال يصله إلا لخصال ثلاث أن يؤخذ بالحق و يعطى بالحق و يمنع من الباطل

"তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোন অধিকার নেই। (১) সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা গ্রহণ করা। (২) ন্যায় পথে তা ব্যয় করা। (৩) সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখা।" (কিতাবুল হারাম-১১০)

ইসলামী রাষ্ট্র শুধু ব্যয় বহনের জন্যই আয় করে না, দেশের গরীব, দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা, বেকারত্ব দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ঋণী লোকদের সাহায্য করার জন্য আয়ের ব্যবস্থা করে।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস দু'ধরনের হতে পারে-
প্রথমতঃ ইসলামী শরীয়াত তথা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত আয়।
দ্বিতীয়তঃ শরীঅত কর্তৃক নির্ধারিত নয়, তবে সমর্থনযোগ্য এমন আয়।

শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত আয়

যে সব আয় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য শরীঅত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল-
১। যাকাত-
২। ওশর বা এক দশমাংশ
৩। ওশরের অর্ধেক বা এক বিশমাংশ
৪। খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ
৫। সাদাকাতুল ফিতর
৬। মালিকানা বিহীন সম্পদ

শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নয় তবে শারীআত কর্তৃক সমর্থিত আয়ের মধ্যে পড়ে এমন আয়

১। খারাজ বা অমুসলিমদের ভূমি থেকে আদায়কৃত কর
২। জিযিয়া বা অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর
৩। আমদানী শুল্ক
৪। জরুরী প্রয়োজনে নির্ধারিত কর
৫। সামরিক কর
৬। ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়।

প্রথম প্রকার আয়ের উৎসসমূহের বিশ্লেষণ

যাকাত

জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান এর ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের কল্যাণ সাধন তার প্রধান কাজ। এ কাজগুলো সম্পাদন করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার চাহিদা মেটাতে যাকাত হচেছ প্রধান উৎস।

ব্যক্তির নিকট পারিবারিক প্রয়োজন বাদ দিয়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে এবং এক বছর তার নিকট অতিবাহিত হয় উক্ত অর্থের আড়াই ভাগ যাকাত হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রদান করা তার উপর ফরয।
আল্লাহ বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা(যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

রাসূল (স) আল্লাহর নির্দেশের সার্বিক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইয়ামেনের গভর্ণর আবু মূসা আল-আশআরীকে বলেন, تؤخذ من أغنياءهم فترد إلى فقراءهم

''তুমি তাদের (ধনীদের) থেকে যাকাত গ্রহণ করবে এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে।'' (বুখারী)

যে সকল ব্যক্তির সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা হবে

যাকাত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার। আল্লাহ তা'আলা শুধু ধনীদের সম্পদে যাকাত ধার্য করেছেন। ধনী বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার কাছে ব্যক্তি ও পারিবারিক খরচ বহন এবং ঋণের দায় শোধের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের বাজার মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে এবং তা ১ বছর পর্যন্ত তার হাতে বা ব্যাংকে জমা থাকে। এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য করা হবে এবং তা আদায় করা হবে।

প্রধানত দু'ধরনের সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করা হবে। (১) যা প্রকাশ্যভাবে যাচাই করা যায় এমন সম্পদ যথা- গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। (২) যা প্রকাশ্যভাবে যাচাই করা যায় না এমন সম্পদ- যথা- স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ ও ব্যবসার পণ্য ইত্যাদি।

ওশর

ওশর (عشر) আরবী শব্দ। শাব্দিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে এক দশমাংশ বা দশভাগের এক ভগ।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, মুসলমানদের যে সকল জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা, নদী ও খালের পানিতে সিক্ত হয়, কিংবা এমনিতেই সিক্ত থাকার ফলে ফসল ও ফলফলাদি উৎপন্ন হয় আর তাতে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি সেচ করার প্রয়োজন হয় না উক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ গরীবদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর নাম হল ওশর।

ওশর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ইসলামী রাষ্ট্র তার কর্মচারীদের মাধ্যমে ওশর আদায়ের ব্যবস্থা করবেন।

নিসফুল ওশর

নিসফ (نصف) মানে অর্ধেক। আর ওশর মানে এক দশমাংশ। একত্রে শব্দ দুটোর অর্থ দাঁড়ায় এক দশমাংশের অর্ধেক বা বিশ ভাগের একভাগ।

সাধারণত যে সব জমিতে ফসল ও ফলফলাদি উৎপাদন করতে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সেচ দেয়া হয় সে সব জমিতে উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদির বিশ ভাগের একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য আদায় করা হয়।

খুমুস

ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কিছু কিছু সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বা খুমুস রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য আদায় করতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ সকল সম্পদের মধ্যে গনীমতের মাল, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ, মাটির নীচ থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত সম্পদ উল্লেখযোগ্য।

গনীমতের মালঃ শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকগণ যে ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র লাভ করে থাকে ইসলামী পরিভাষায় তাকে গনীমতের মাল বলা হয়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন-

وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

''জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।'' (সূরা আল-আনফাল : ৪১)

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের যে সব ধন-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র যানবাহন ও খাদ্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হবে, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ বিজয়ী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবী ও নিঃস পথিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করা হবে।

ইসলামের প্রথম দিকে সৈনিকদের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন-ভাতা ছিল না। গনীমতের মালের চার-পঞ্চমাংশই তাদের মধ্যে বন্টন করা হতো। বর্তমান যুগে যেখানে সৈনিকদের বেতন নির্দিষ্ট রয়েছে সেখানে গনীমতের মাল তাদের মধ্যে বন্টন করার প্রয়োজন নেই। বরং এ সম্পদ সৈনিকদের বেতন বাবদ খরচ করার জন্য সরকারী কোষাগারে জমা রাখা হবে।

খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ বলতে মাটির নিচে প্রাপ্ত ঐ সকল সম্পদ যা আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করে রেখেছেন, মানুষ নিজেরা পুতে রাখেনি। সে খনিজ সম্পদ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসা, দস্তা, তেল, গ্যাস, কয়লা ইদ্যাদি যাই হোকনা কেন তার কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় আয়ের জন্য আদায় করতে হবে।
ইমাম আবু ইউসুফ (র) লিখেছেন-

كل ما أصيب فى المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص فإن فى ذلك الخمس.

''এভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে (এক-পঞ্চমাংশ) রাজস্ব আদায় করতে হবে।''

মূলত জমির মালিক নিজস্ব খরচে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করার বেলায় ইসলামী অর্থনীতিতে উল্লেখিত বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খনিজ সম্পদের রয়ালটি নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান যুগে খনিজ সম্পদের অবস্থা একইরূপ নয়। এবং উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও এক রকম হয় না। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের বিভিন্নতার দরুন মূল্যের দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এমন কি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়ও সকল খনিতে সমান হয় না। কাজেই প্রত্যেকটি খনিজ 'রয়ালটি'র কোন স্থায়ী পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নয়। এর পরিমাণ নির্ধারণের ভার ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজনে সরকার খনিজ সম্পদের সংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে তার পুরোটাই রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদ

সকল প্রকার সামুদ্রিক সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। সামুদ্রিক সম্পদ বিশেষ করে মৎস্য ও মুক্তা আহরণের উপর কর ধার্য হতে পারে। হযরত উমর (রা) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করেন এবং তা যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। কোন এক কর্মচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলন, 'সমুদ্র হতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য হতেই রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে। কারণ, এটাও আল্লাহ তাআলারই একটি দান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ মতই পোষণ করতেন। নদী, ঝিল, বিল ইত্যাদি হতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে যে মৎস্য উৎপাদন করা হয় তারও এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রাপ্য হবে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের মতেও জলভাগ হতে যা কিছু উৎপন্ন হবে, তা হতেও রাজস্ব আদায় করতে হবে। কারণ তা স্থলভাগের খনিজ সম্পদেরই সমতুল্য।

فيما أخرج الله من البحر الخمس.

"আল্লাহ তাআলা সমুদ্রে যে সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তা হতে রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে।"

ভূ-গর্ভে গচ্ছিত সম্পদ

"ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত ধন" অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পুঁতে রেখে যাওয়া সম্পদ যা মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা ভাল করে জানে না। পরবর্তীতে কেউ তা সন্ধান পেল এবং তা উত্তোলন করল। এ ধরনের সম্পদও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হবে। এ ধরনের সম্পদকে "রিকায" বলে। রাসূল (স)-এর উপর ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এক পঞ্চামাংশ কর নির্ধারণ করেছেন। রাসূল (স.) বলেন- و فى الركاز الخمس "রেকায বা ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।"

সাদাকাতুল ফিতর

রমযান শেষে ঈদের দিন ধনী ব্যক্তির গরীবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা তার মূল্য বন্টন করে তাকে সাদকাতুল ফিতর বলে। এ সাদকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হতে আদায় করতে বাধ্য। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটাকেও রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) লিখেছেন- "ইসলামী খিলাফতের যুগে এ সাদকাও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হতো এবং তা হতে পরিকল্পনানুযায়ী নির্দিষ্ট এলাকার গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হতো।"

মালিকানাহীন সম্পদ

ইসলামী রাষ্ট্র সমগ্র দেশের জনগণের দায়িত্বশীল। অতএব দেশের যে সব ধন-সম্পদের কোন মালিক বা উত্তাধিকারী নেই, তার মালিক হবে ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা জমা হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই তা ব্যয় করা হবে। হযরত উমর (রা) মিসরের শাসনকর্তার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "যে মৃত ব্যক্তির, উত্তরাধিকারী নেই তার যাবতীয় ধন-সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে।" নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন -

أنا وارث من لا وارث له أرثه و أعقل عنه.

''যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী আমি। আমি-ই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাব এবং তার পক্ষ হতে দায়িত্ব পালন করব।" (কিতাবুল আমওয়াল-২২১)

বস্তুত নবী করীম (স) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেই এ কথা ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং এ সম্পদ রাষ্ট্রের। হযরত ওমর ফারূক ও (রা) এরূপ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

من كان له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه و من لم يكن له عقب فاجعل ما له فى بيت مال المسلمين فإن ولاءه للمسلمين.

''যার উত্তরাধিকারী থাকবে, মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পত্তি তার উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বন্টন কর। আর যার উত্তরাধিকারীরূপে পশ্চাতে কেউ নেই, তার ধন-সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দাও। (ফুতূহু মিসর ও আখবারূহা)

যেসব পড়ে থাকা মাল কোথাও পাওয়া যাবে এবং যার মালিক খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাও অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হবে।

দ্বিতীয় প্রকার আয়ের উৎসসমূহের বিশ্লেষণ

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য যে সকল আয়ের উৎস রয়েছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারে এমন কিছু খাত রয়েছে যার পরিমাণ আল্লাহ তাআলা কিংবা রাসূল (স) নির্ধারণ করে যান নি। তা নির্ধারণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।

সময় ও অবস্থার চাহিদার আলোকে ইসলামী সরকার তার পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কর নির্ধারণের মৌলিক নীতি অবশ্যই অনুসরণ করা হবে। উক্ত খাতগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

খারাজ বা অমুসলিমদের ভূমি রাজস্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহের অন্যতম হচ্ছে খারাজ (خراج)। খারাজ শব্দটি মূলত ফারসী থেকে এসে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। শব্দটির অর্থ হল Tax (ট্যাক্স) বা কর।

ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, খারাজ বলতে অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খারাজের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেননি। ইসলামী রাষ্ট্রই খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর নির্ধারণে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে কারো উপর অন্যায় না হয়।

বিশেষজ্ঞ একটি টিম গঠন করে তাদের মাধ্যমে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ, গুণাগুণ ও উর্বরতা, পানি সেচের আবশ্যকতা ও অন্যাবশ্যকতার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

জিযিয়া বা অমুসলমানদের উপর ধার্যকৃত কর

জিযিয়া কর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের আর একটি প্রধান উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হবে। ইসলামের অর্থনৈতিক পরিভাষায় তাকে 'জিযিয়া কর' বলে। জিযিয়া কর অর্থ 'বিনিময়'। রাষ্ট্র প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে নিরাপত্তা দান করে, তাই-এর বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কর আদায় করার অধিকার রাখে। 'জিযিয়া' অনুরূপ একটি কর। কুরআন মাজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

''যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।'' (সূরা আত-তাওবা : ২৯)

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দু'টি কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনায় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধ্যানুসারে নির্ধারিত কর প্রদান করা।

বাহ্যত মনে হতে পারে যে, জিযিয়া কর নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলমানদের প্রতি সমান আচরণ করেনি। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রকে হেফাজত করা, তার কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মূল দায়িত্ব মুসলমানদের উপর, তা সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রের ব্যয় মেটাতে ওশর, নিসফ (অর্ধ) ওশর ইত্যাদি কর প্রদান ছাড়াও যাকাত প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনে নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অমুসলিমদের উপর যাকাত নেই, দেশ রক্ষার কাজে তারা কোন অর্থ ব্যয় কিংবা জীবন দান করেনা অথচ দেশের সার্বিক সুবিধা তারাও ভোগ করে। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যায়ে সমতা নিয়ে আসার জন্য তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে।

জিযিয়া করের পরিমাণ ইসলামী আইনে নির্ধারিত নেই। এটা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। অবস্থা ও চাহিদার আলোকে এ করের পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে।

জিযিয়া সাধারণত মুদ্রায় আদায় করা হবে। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশেষ কোন শিল্পপণ্যের আকারেও তা আদায় করা অসংগত হবে না। নবী করীম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদূন বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট হতে জিযিয়া বাবদ শিল্পপণ্যও গ্রহণ করেছেন।

ব্যবসা পণ্যে ধার্যকৃত কর

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন এবং বৈদেশিক শিল্পপণ্যের আমদানীতে নিরূৎসাহিত করার চেষ্টা করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রকে এজন্য সর্বপ্রথম বৈদেশিক পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার উপর শুল্ক ধার্য করতে হয়। অনুরূপভাবে অন্য রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে এবং অর্থ বিনিয়োগ করবে তাদের উপরও এ শুল্ক ধার্য করা হবে। কারণ তাদের জানমাল ও ব্যবসা বাণিজ্যের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ইলামী রাষ্ট্রের উপর অর্পিত এবং এ দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে

তাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় শুল্ক আদায় করতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর রা.-এর সময়ই এ শুল্ক সর্বপ্রথম ধার্য হয়েছিল। বস্তুত এ শুল্ক প্রদান করেই বিদেশী নাগরিকগণ ইসলামী রাজ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

এ ধরনের করের পরিমাণ অবস্থা, সম্পদ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। আর আদায়কৃত শুল্ক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে।

জরুরী প্রয়োজনে নির্ধারিত কর

ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার বিশেষ সময় বা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে পড়ে ; কিংবা ব্যয় অপেক্ষা আয় কমে যায়। জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে যেমন কোন নতুন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অথবা সকল প্রকার আয়ের পরেও রাজ্যের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব না হয়; বা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ইসলামী রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (স) যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করার পরও আকস্মিকভাবে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং মুসলমানদের কাছে তিনি সে জন্য অর্থ সাহায্যের দাবি পেশ করেন।

সাময়িক কর

সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কার্য সমাধানের জন্য এবং দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বায়তুলমালে সম্পদ জমা থাকলে জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা ঠিক নয়। তবে দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি ইসলামী রাষ্ট্রে অর্থের খুবই প্রয়োজন হয় এবং বায়তুলমালে সম্পদের ঘাটতি পড়ে তখন জানগণের সম্পদের উপর যে কর নির্ধারণ করা হয় তাকে সাময়িক কর বলে।

ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়

সাধারণভাবে রাষ্ট্রের যে আয় হয়ে থাকে, সেই অনুসারেই রাষ্ট্রের যাবতীয় খরচ বহন করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য জরুরী পরিস্থিতিতে আকস্মিক প্রয়োজন দেখা দিলে জরুরী কর ধার্য করে তা পূরণ করতে হয়। কিন্তু তাতেও যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয় তখন সরকারকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের মধ্যে পড়ে
ক. শুধু ওশর (১০ ভাগের ১ ভাগ); খ. শুধু জিযিয়া কর;
গ. শুধু যাকাত; ঘ. সব উত্তরই সঠিক।

২. মুসলমানদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর যে রাজস্ব ধার্য করা হয় তাকে বলা হয়
ক. ওশর; খ. খুমুস;
গ. খারাজ; ঘ. জিযিয়া।

৩. যাকাত হল-
ক. একটি চাঁদা বিশেষ; খ. একটি কর বিশেষ;
ঘ. সম্পদ সম্পর্কিত ইবাদাত; ঙ. জমির ফসলের উপর ধার্যকৃত রাজস্ব যা প্রদান করা একটি এবাদত।

৪. সামুদ্রিক সম্পদে করের পরিমাণ হচ্ছে-
ক. ওশর বা এক দশমাংশ; খ. খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ;
গ. শতকরা আড়াই ভাগ; ঘ. অর্ধেক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন
২. রাষ্ট্রীয় আয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি কী ? লিখুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস কি কী ? সংক্ষেপে বলুন।
৪. যাকাত কী ? যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস-প্রমাণ পেশ করুন।
৫. ওশর বলতে কী বুঝায় ? কী ধরনের ফসলের ওশর দিতে হয় ?
৬. খারাজ কী ? কারা কিসের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রকে খারাজ প্রদান করবে ?
৭. জিযিয়া বলতে কী বুঝায় ? জিযিয়া কাদের উপর ধার্য করা হয় এবং কেন ?
৮. ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের ঋণ গ্রহণ কী বৈধ ? কেন ?
৯. সামরিক কর কখন গ্রহণ করা হয়?
১০. কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি কি?

বিশদ উত্তর-প্রশ্নঃ

১. ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. ইসলামী শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত আয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৩. শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত আয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ২

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যায়ন শেষে আপনি—

- ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিধি কী তা বালতে পারবেন;
- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়ের খাতসমূহ লিখতে পারবেন;
- রাষ্ট্রপ্রধান ও পরামর্শসভা কর্তৃক ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র মূলত তার ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই আয় করে থাকে। তাই ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট খাত আলোচনার পূর্বে প্রথমেই জানা দরকার ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিধি কতটুকু ? অন্য কথায় বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের এমন কি কি দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করতে সরকারের অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নিম্নে বর্ণিত ১১ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১. দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাকে স্থাপন করা ও সে অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

২. দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা, সে জন্য শক্তিশালি সশস্ত্র বাহিনী এবং নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে।" (সূরা আল-আনফাল : ৬০)

৩. অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃংখলা, শাসন ও বিচার-ইনসাফ সুপ্রতিষ্ঠা করা, সেজন্য পুলিশ ও দেশরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা, সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার পরিচালনা করা।

৪. দেশবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, অভাব-অভিযোগ ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অজম্মা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা।

৫. সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, উত্তরাধিকার আইন কার্যকর করণ, সামাজিক জটিলতার মীমাংসা করণ। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের জন্য প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, বিনামূল্যে শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা।

৬. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যেমন-রাস্তা, পুল-রেললাইন, বিমানপথ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইনসহ সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম স্থাপণ করা ইত্যাদি।

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমদানী-রফতানীর জন্য সামুদ্রিক যান বাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক-স্তম্ভ ও বিমানঘাটি স্থাপন করা।

৮. কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেচের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন, বড় বড় পুকুর, খাল-নদী ও কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ করা, আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী ও সার প্রয়োগে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা।

৯. প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন, জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করতে পারে।

১০. পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল মিত্র দেশে রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন, দেশ-বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরে মুসাফিরখানা স্থাপন করা, যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাত বা গাছ তলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য না হয়।

১১. ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও তার উন্নতি বিধান ; কৃষক, মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা।

ব্যয়-নীতি

দেশের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজকোষে জনগণের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থসম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের এ অর্থ ইচ্ছেমত ব্যয় করার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যে মূলনীতি প্রদান করেছে তা হলো-

ব্যয়নীতি হবে অত্যন্ত সুষ্ঠু, সংযত ও সুবিচারপূর্ণ। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতকর্তা, বিচক্ষণতা, সামগ্রিক সামঞ্জস্য ও মিতব্যয়িতা রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানসহ সরকারের উপর মৌলিক দায়িত্ব।

ব্যয়ের খাতসমূহ

একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে জনকল্যাণের জন্য যত ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামী রাষ্ট্রকে পালন করা প্রয়োজন তার সকল খাতেই ইসলামী ব্যয়নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্র তার সঞ্চিত সম্পদ ব্যয় করতে পারবে। তবে ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের এমন কিছু আয়ের খাত রয়েছে যেগুলো সরকার নিজের ইচ্ছেমত যে কোন খাতে ব্যয় করতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব বিচারে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আল-কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত ব্যয়ের খাত
২. অনির্ধারিত ব্যয়ের খাত।

আল-কুরআনের নির্ধারিত ব্যয়ের খাত

ইসলামী রাষ্ট্রের যত আয় হয়ে থাকে তার মাত্র তিন ধরনের আয় যেমন, গণীমতের মাল, ফাই বা বিনা যুদ্ধে লব্দ ধন-সম্পদ, যাকাত- এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যান্য খাতের আয় ইসলামী রাষ্ট্র মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত ক্রমে জনকল্যাণমূলক যে কোন বৈধ খাতে ব্যয় করতে পারবে।

এখানে প্রথমে আল-কুরআনে বর্ণিত খাতগুলো উল্লেখ করা হল-

(ক) গণীমতের মাল ঃ এর ব্যয়ের খাত কুরআন মাজীদে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ.

''জেনে রেখ, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের।'' (সূরা আন-আনফাল : ৪১)

এছাড়া বাকী চার ভাগ- সামরিক লোকদের জন্য নির্ধারিত।

এ থেকে বুঝা যাচেছ, পাঁচ ভাগের একভাগ উল্লিখিত খাতে বন্টনের জন্য বায়তুল মালে জমা করা হত। আর বাকী চারভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে সরাসরি বনটন করে দেয়া হত। কিন্তু নবী কারীম (স)-এর ইনন্তিকালের পর গনীমতের মালের একপঞ্চমাংশকে পাঁচভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ করা হতো।

(খ) ফাই ও বিনাযুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদ ঃ এর ব্যয়ের খাতও কুরআন মাজীদে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এটা প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। হযরত নবী করীম (স) এ ধরণের যাবতীয় মাল সম্পদকে নিজেরই তত্ত্বাবধানে ব্যয় ও বন্টন করতেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ.

''আল্লাহ গ্রামবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দান করেছেন, তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।'' (সূরা আল-হাশর : ৭)

বর্তমানে রাসূল (স.) ও তাঁর নিকট আত্মীয়রা যেহেতু জীবিত নেই। আয়াতে উল্লেখিত 'রাসূল এবং তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাখা হবে এবং তা দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণকর কাজে এবং দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায়- ব্যয় করা হবে। ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের অংশ তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।

খারাজ, জিযিয়া করের প্রভৃতি অর্থ ফাই'র অন্তর্ভুক্ত। তাই খারাজ ও জিযিয়ার সম্পদ উল্লেখিতখাতে ব্যয় করা হবে।

(গ) যাকাতের সম্পদ ঃ যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার খাতও কুরআন মাজীদ নির্ধারিত করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"সাদাকা (যাকাত) তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবা : ৬০)।

এখানে আল্লাহ তাআলা যাকাত ব্যয়ের জন্য আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

বেকার শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা

যাকাত যাদের জন্য এবং যে সকল খাতে ব্যয় করা যাবে তার প্রথম খাত হল- কুরআনের পরিভাষায় 'ফকীর' আর ফকীর এমন মজুর ও শ্রমজীবীকে বলা হয়, শারীরিক দিক দিয়ে যে কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। এ দিক বিবেচনায় সে সব অভাবগ্রস্ত মেহনতী লোককেও 'ফকীর' বলা যাবে, যারা কোন জুলুম হতে আত্মরক্ষা করার জন্য নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছে। কোন সামরিক এলাকা হতে বিতাড়িত লোকদেরও 'ফকীর' বলা যাবে।

আল-কুরআনে বর্ণিত ফকীর শ্রেণীর মাঝে মজুর শ্রমিকরাও শামিল। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য যাকাত বাবদ সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। গরীবদের সাহায্য দান এবং সকল প্রকার দুঃখ-দুর্ভোগ ও অভাব-অনটন হতে মুক্তিদানই এর উদ্দেশ্য, যেন সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তারা পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে পারে। বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের জন্য এটা এক চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ।

মিসকীন বা অক্ষম লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা

'ফকীর'দের ন্যায় মিসকীনদের জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হবে। 'মিসকীন' ঐ ব্যক্তিকে বলে দৈহিক অক্ষমতা যাকে চিরতরে নিষ্কর্মা ও উপার্জনহীন করে দিয়েছে ; বার্ধক্য, রোগ অক্ষমতা ও পংগুত্ব যাকে উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করে দিয়েছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন করতে পারে বটে, কিন্তু যা উপার্জন করে তা দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পংগু ইত্যাদি সকল লোককেই 'মিসকীন' বলা যায়। তাদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে এমন পরিমাণ অর্থ সাহায্য দেয়া উচিৎ যাতে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় এবং তারা দারিদ্র্যের দুঃখময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি পেতে পারে।

ইসলাম একদিকে লোকদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি হতে নিবৃত্ত করেছে, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় বাজেটে বেকার, পংগু, অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও উপার্জন ক্ষমতাহীন লোকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দানেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে।

যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

যাকাত বিভাগের কর্মচারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত থাকে, আর অপর ভাগ তা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পন্থায় বন্টন করার কাজ সম্পন্ন করে। এই উভয় ধরনের কাজে যত কর্মচারী নিযুক্ত থাকবে, তাদের সকলের প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ বেতন দেয়া এবং গোটা বিভাগে যা কিছু ব্যয় হবে তা যাকাত থেকে সমাধা করা হবে। প্রত্যেক কর্মচারীকে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার অনুপাতে বেতন দেয়া হবে। তার নিম্নতম হার হচ্ছে ন ্যনতম প্রয়োজন পূরণ।

ক্রীতদাসদের মুক্তিবিধান

যাকাতের একটা অংশ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ লোকদের মুক্ত ও স্বাধীন করার কাজে ব্যয় করা যাবে। এ অর্থ লাভ করে তার বিনিময়ে নিজেকে গোলামীর বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারবে।

ইসলামী আদর্শের সূচনালগ্নে আরবদেশে দাস-প্রথার খুব বেশী প্রচলন ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরকারী অর্থের সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রথার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে। ফলে খুলাফায়ে রাশেদূনের যুগে এই প্রথা রহিত হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে দাস প্রথা নেই বললেই চলে। তাই এ যুগে দেশ রক্ষার জন্য অথবা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুসলিম সৌনিকগণ যদি শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দ্বারা মুক্ত করার ব্যবস্থা করা যাবে। ঘরের কাজের ছেলে ও মেয়েদেরকে ক্রীতদাস-দাসিদের অংশ দেয়া যেতে পারে, যাতে তারা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

ঋণ মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা

যাকাতের একটা অংশ ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। যারা নিজেদের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করে। এ ঋণগ্রস্ত লোক যদি নিজে ধনী না হয়, তবে তাদেরকে যাকাতের এ অংশ হতে সাহায্য করা যাবে।

নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন-

من ترك مالا فلورثته و من ترك كلا فإلينا

"যে লোক ধন-সম্পত্তি রেখে মরে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর যে লোক কোন ঋণের বোঝা অনাদায় রেখে মারা যাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে যদি তা আদায় করা না যায়, তবে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।" (মুসলিম)

নবী করীম (স.)-এর এ ঘোষণায় নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণ শোধ করার এবং তাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা-ব্যবস্থার ভার সরাসরিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপর্ণ করা হয়েছে।

বিনাসুদে ঋণ দান

ইসলামী রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত লোকদেরকে কেবল ঋণভার হতে মুক্ত করবে তাই নয়, বরং জনগণকে উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন অন সারে ঋণ দেয়ারও ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা সুদের ভিত্তিতে হবে না।

উপরন্তু যাকাতের যে অংশ ঋণ শোধ করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে তা হতে বিনা সুদে ঋণ দেয়া যেতে পারে। ইসলামী অর্থনীতিতে সুদী কারবার ও সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল বলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বায়তুলমলসমূহ এ জন্য তৎপর থাকত। ফলে সে সময় সুদী কারবারের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে বিনাসুদে ঋণ দেয়ার জন্য মুসলিম জনগণকে উৎসাহিত করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উপরও উক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে ? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৪৫)

ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

যাকাতের একটা অংশ ব্যয় হবে আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রত্যেক জন কল্যাণকর কাজে- দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই এই অর্থ ব্যয় করা যাবে।

নিঃস্ব পথিকদের প্রয়োজন মেটানো

যাকাতের একটা অংশ 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্য ব্যয় করা যাবে। যেসব লোক কোন পাপ-উদ্দেশ্যে নয় বরং কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশ ভ্রমণে বের হয় এবং সম্পূর্ণভাবে নিঃসম্বল হয়ে পড়ে, তাদেরকে যাকাতের এ অংশের টাকা হতে এমন পরিমাণ দান করা যাবে, যেন তা দ্বারা তাদের তাৎক্ষণিক অনিবার্য প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং নিজ ঠিকানায় ফিরে যেতে পারে। এমন কি, যেসব মেহনতী ও শ্রমজীবী লোক কাজের সন্ধানে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে চায় ; কিন্তু তাদের পথ খরচের সংস্থান হয় না বলে যেতে পারে না, এরূপ লোকদের যাকাতের এ অংশের অর্থ হতে যাতায়াতের খরচ দান করা যাবে। কোন গ্রামবাসী শ্রমিক শহরে এসে উপার্জন করতে থাকা অবস্থায় অনিবার্য কোন কারণে যদি তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়, এবং তার পথ খরচের কোন অর্থ না থাকে, তাকে লোকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত দরাজ করতে বাধ্য না করে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাতের এ অংশ থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবে। এসব আকস্মিক প্রয়োজনশীল লোকের নিজ নিজ ঘরে যদি বিপুল পরিমাণের অর্থ-সম্পদও থেকে থাকে, তবুও তাকে এ সময় যাকাতের অর্থ হতে সাহায্য দান করা শরীয়ত সম্মত কাজ হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি রয়েছে।

যাকাতের এ অংশের অর্থ হতে কেবল যে নগদ টাকা দিয়ে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে তাই নয় পথিকদের জন্য মুসাফিরখানা, ওয়েটিং রুম, গণ-গোসলখানা ও সৌচাগার ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে। যেসব রাস্তাঘাট ও পুল ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ সাধারণ লোকদের পথ চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে তাও এ অংশের অর্থ দ্বারা মেরামত বা পুন:নির্মাণ করা যেতে পারে।

অনির্ধারিত ব্যয়ের খাত

পূর্বের আলোচনায় ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয়ের যে সকল খাত কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত খাতগুলোর বাইরেও এমন অনেক খাত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।

ইসলামী অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করার সীমাবদ্ধ অনুমতি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীকে প্রদান করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত নির্ধারিত খাতের ব্যয় ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্যান্য খাতের ব্যয় তিনি পার্লামেন্টে বা মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ব্যয় করতে পারবেন। নিম্নে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি খাতের উল্লেখ করা হল-

রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন ভাতা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতন বায়তুলমাল হতেই আদায় করা হবে। নবী করীম (স) মুসলমানদের সামগ্রিক আয় হতে যে অংশ গ্রহণ করতেন, তা হতেই তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ হতো।

তার ইন্তিকালের পর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পূর্বে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত উমর ফারূক (রা) মুসলমানদের পক্ষ হতে বললেন ঃ "আপনি ব্যবসায়কার্যে লিপ্ত হলে মুসলমানদের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য অনেকখানি ব্যাহত হবে। অতএব আপনি ব্যবসা ত্যাগ করুন।"

হযরত আবু বকর (রা) নিজের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বললেন ঃ "জনগণের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যও চালিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কাজে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ও ঐকান্তিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ওদিকে আমার ও পরিবারবর্গের জিবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রয়োজনও রয়েছে।"

তখন মুসলমানদের মজলিসে শূ'রায় খলীফাকে বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

রাষ্ট্রপ্রধানকে কি পরিমাণ বেতন দেয়া হবে, এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর একটি নীতিকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন-

أنا و مالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أخذت بالكفاف أو أكلت بالمعروف.

"আমি ও তোমাদের সামগ্রিক ধন-সম্পদের উদাহরণ হল ইয়াতীমের উপর অভিভাবকের ধন-সম্পদের সমতুল্য অর্থাৎ আমি যেন ইয়াতীমের মালেরই রক্ষনাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই তবে আমি বায়তুলমাল হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করব। অথবা ন্যায়সংঙ্গতভাবে তা থেকে আহার করব।" (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃ. ১১৭)

এ থেকে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানের বেতনের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্য-মূল্য বিবেচনায় রাখা হবে। সময় ও অবস্থার আলোকে বেতন কম-বেশী হবে।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনও বায়তুলমাল হতে প্রদান করা হবে। কারণ তারা সকলেই জনগণের সামগ্রিক ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপরে আত্মনিয়োগ করে থাকে। অতএব জনগণের সামষ্টিক ধনভান্ডার-বায়তুলমাল হতে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেয়াটাই স্বাভাবিক। নবী রকীম (স.) নিজে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও অনুরূপ করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতি সাধারণভাবে সকল প্রকার শ্রমিকের বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের-বেতনের হার নির্ধারণের মূলনীতি উপস্থাপন করেছে।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের স্বরূপ এবং প্রয়োজন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। নবী করীম (স.)-এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত একটি নীতি ঘোষণা করেছেন ঃ

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكسب خادما و إن لم يكن له مسكنا فليكسب مسكنا. من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.

"যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, সে যেন বিবাহ করে। তার চাকর না থাকলে সে একজন চাকর নিবে। তার ঘর না থাকলে সে একটি ঘর নিবে। এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় সীমালংঘনকারী, না হয় চোর হিসেবে গণ্য হবে।" (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)

লাওয়ারিস শিশুদের লালন-পালন

লা-ওয়ারিস শিশু সন্তানদের প্রতিপালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে সন্তান নিজে উপার্জনে সক্ষম নয়, যার নিজের কোন অর্থ-সম্পদ নেই, কিংবা যার কোন অভিভাবক বা কোন নিকটাত্মীয়ও এমন নেই যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে ; ইসলামী রাষ্ট্রই তার লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব নিবে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের সন্তানদের নিষ্কর্ম বসে খেতে দেবে না বরং তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী করে গড়ে তুলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দান করবে। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিস সন্তানদের সম্পর্কেও এ নীতি প্রযোজ্য হবে।

কয়েদী ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ

যেসব অপরাধীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হবে, যেসব অপরাধীর বারবার অপরাধের দরুন তাদেরকে দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত হবে, তাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবেশন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর তা বায়তুলমাল হতে প্রদান করা হবে। যেসব লা-ওয়ারিস কয়েদী মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তাদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব হবে।

ক্ষতিপূরণ দান

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন উন্নয়ণমূলক কাজের জন্য কিংবা যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ, সৈনিকদের চলাচল অথবা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নাগরিকদের বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত হলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। হযরত উমর (রা)-এর নিকট একজন কৃষক এসে অভিযোগ করল যে, সিরিয়ার একদল সৈন্য পথ অতিক্রম করার সময় তার শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বায়তুলমাল হতে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন।

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা

ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা শুধু মুসলিম নাগরিকদের দান করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল দেশবাসীই এ নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। ইসলামি অর্থনীতিতে যেসব স্থানে 'মিসকীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদে তাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রেই ধর্মমত নির্বিশেষে নিঃস্ব-দরিদ্র নাগরিকদের বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে হযরত খালিদ ইবন অলীদ (রা.) হীরাবাসীদের সাথে যে সন্ধি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন-

''আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে অথবা কোন ব্যক্তি যদি সহসা এত বেশী দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে, তখন তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে, তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে ব্যবস্থা করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বসবাস করবে।"

"হযরত উমর (রা.) এক বৃদ্ধ ইয়াহূদী ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল, আমাকে জিযিয়া আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা আদায় করার আমার কোন সামর্থ্য নেই। হযরত উমর (রা.) এটা শুনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, বায়তুলমাল খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, এর জন্য ভাতা নির্ধারন করে দাও এবং এর নিকট হতে জিযিয়া নেয়া বন্ধ কর।" অতঃপর বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, এর যৌবনকালকে আমরা কাজে ব্যবহার করব, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় তাকে অসহায় করে ছেড়ে দেব, তা কোন মতেই ইনসাফ হতে পারে না।"

সারকথা

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাত অনেক। নাগরিকের কল্যাণে সকল কাজ আঞ্জাম দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের কথা উল্লেখ করা হল।

আধুনিক যুগে জনগণের কল্যাণে যে সকল মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়, সকল কাজের ব্যয়ভার ইসলামী রাষ্ট্র বহন করবে। শুধু যাকাত, গণীমাত ও ফাই এর সম্পদ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হবে।

তবে ইসলামী রাষ্ট্র তার কোন সম্পদ শরীআত সম্মত নয় এমন কোন কাজে ব্যয় করতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাত কয় ধরনের ?

ক. তিন ধরনের; খ. দু' ধরনের;
গ. চার ধরনের; ঘ. বিভিন্ন ধরনের।

২. যাকাত ব্যয়ের নির্ধারিত খাত কয়টি ?

ক. ৮টি; খ. ৬টি;
গ. ৯টি; ঘ. ১০টি।

৩. বর্তমান যুগে গণীমতের মালে রাসূল ও তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ কিভাবে ব্যয় করা হবে ?

ক. ফকীর-মিসকিনকে দান করা হবে; খ. সৈন্যদের বেতন দেয়া হবে;
গ. যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম কেনা হবে; ঘ. রাষ্ট্রপ্রধানকে অধিক বেতন দেয়া হবে।

৪. রাষ্ট্রপ্রধানের বেতন কোন খাতে থেকে প্রদান করা হবে ?

ক. যাকাতের খাত থেকে; খ. গণীমতের খাত থেকে;
গ. ফাই এর খাত থেকে; ঘ. উপরোক্ত তিনটি খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত থেকে।

৫. অমুসলিম নাগরিকের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর

ক. অবশ্য কর্তব্য; খ. সাধারণ কর্তব্য;
গ. মোটেও উচিৎ নয়; ঘ. যতটুকু সম্ভব করা উচিৎ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়নীতি কী ? আলোচন করুন।
২. কোন কোন সম্পদের ব্যয়ের খাত কুরআনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ? সংক্ষেপে লিখুন।
৩. যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাত কী কী ? কুরআনের আলোকে লিখুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে অমুসলিমদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করবে ? লিখুন।
৫. যাকাত থেকে কিভাবে ঋণদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায় ? আলোচন করুন।

বিশদ-উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ? বর্ণনা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের খাতগুলো বিস্তারিত লিখুন।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি রাজস্ব

পাঠ ঃ ৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যায়ন শেষে আপনি—

- ভূমি রাজস্ব নির্ধারনের বিধান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ওশরী ও নিসফে ওশরী জমির মাঝে পার্থক্য করতে পারবেন;
- ওশর ও খারাজের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন।

ভূমি রাজস্ব

জমি (ভূমি) যার উপর আমরা ঘর বাড়ি তৈরি করি, ফসল উৎপাদন করি, মিল-কারখানা স্থাপন করি এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি মানুষের সাময়িক ভোগের জন্য (ভূমি) সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন- ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشاً ''তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা করেছেন।'' (সূরা আল-বাকারা : ২২)

প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে খন্ড খন্ড ভূমি ভোগ দখলের মালিক হলেও ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে বিধায় তার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও অধিকার বিরাজমান। তাই জনসাধারণকে ভূমি ভোগের বিনিময়ে এক ধরনের কর প্রদান করা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেমন ভোগকারীর উপর কর্তব্য, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও অনুরূপ কর্তব্য।

ভূমি রাজস্ব

রাষ্ট্রের সকল প্রকার ভূমি ভোগ করার বিনিময়ে ভোগদখলকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে কর প্রদান করে তাকে ভূমি রাজস্ব বলে।

ভূমির শ্রেণি বিভাগ

ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়- ওশরী জমি ও খারাজী জমি।

যে জমির মালিক মুসলমান অথবা মুসলমানই যে জমি সর্ব প্রথম আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে, অথবা যথারীতি যুদ্ধ করে যে সব জমি মুসলমানগণ দখল করেছে, এককথায় যে জমির মালিক মুসলমান তা ওশরী হিসেবে গণ্য।

খারাজী জমি

আর যে সকল জমির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমগণই যে জমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র যেসব জমি অমুসলিমদের কাছ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে লাভ করার পর তাদের মতামত নিয়ে তাদেরকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তর করে দিয়েছে তা সবই 'খারাজী' জমি হিসেবে পরিচিত।

ওশরী ও খারাজীর নামকরণ

''ওশর'' শব্দটি আরবী। এর অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ। মুসলমানদের চাষাবাদকৃত জমিতে ফসলের এক-দশমাংশ (ওশর) বা এক-দশমাংশের অর্ধেক (নিসফুল ওশর) পরিমাণ রাজস্ব গ্রহণ করা হয় বলে উহাকে ওশরী জমি বলে।

আর ''খারাজ'' শব্দটি আরবী শব্দ। খারাজা থেকে উৎপত্তি। খারাজা শব্দের অর্থ হল কর। যেহেতু অমুসলিমদের জমির উপর কর ধার্য করা হয় তাদেরকে ফসলের অংশ বিশেষ কর দিতে হয় না তাই তাদের ভোগকৃত জমিকে খারাজী জমি বলে। তবে অমুসলিমদের যে সব জমি মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তা যদি মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে ফসলের অংশ বিশেষের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বর্গা চাষের জন্য প্রদান করে তাহলে অমুসলিমগণ ফসলের অংশ বিশেষ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে (খায়বারের দখলকৃত জমিতে মহানবী (স.) তাই করেছেন)।

ভূমি রাজস্বের আইনগত ভিত্তি

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হিসেবে ভূমির উপর রাজস্ব ধার্য করা হয়। আল্লাহ তাআলা ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলেন-

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে উৎপন্ন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

এই আয়াতের প্রথম অংশ হতে প্রমাণিত হয় যে, যাবতীয় নগদ ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সার উপর যাকাত ফরয হয়। শেষাংশ হতে ভূমি রাজস্ব বা ওশর দেয়ার আদেশ প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের জমি থেকে রাজস্ব হিসেবে যে ফসল নেয়া হয় তা ভূমির যাকাত হিসেবে গণ্য।

ভূমি রাজস্ব আদায় করার আদেশ নিম্নলিখিত আয়াতে অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন-

كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ.

"এর ফল আহার করবে আর ফল তোলবার দিনে এর হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবেনা; নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আন'আম : ১৪১)

এখানে 'হক' অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিনিময়। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে এটা আদায় করতে হবে।

ভূমি রাজস্বের প্রকার

ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি থেকে তিন ধরনের রাজস্ব আদায় করা, হয়। (১) ওশর, (২) নিসফুল ওশর, (৩) খারাজ।

ওশর

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ওশর মানে এক-দশমাংশ। মুসলমানরা যে সকল জমির মালিক এবং যা আবাদ ও চাষোপযোগী করা হয়েছে। চাষাবাদ করার সময় নিজের খরচে সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়নি বরং উক্ত জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা নদীর পানিতে সেচের কাজ সম্পাদিত হয়েছে । এ ধরনের জমিতে ওশর বা এক-দশমাংশ ফসল ইসলামী সরকারকে ভূমি রাজস্ব হিসেবে দিতে হয়। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন,

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر و فيما سقى بالسوانى والنضح نصف العشر.

"যে সকল জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা খালের পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যা সাধারণত সিক্ত থাকে সে জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ এবং যে জমি পানি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল রাজস্বরূপে দিতে হবে।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নবী করীম (স) যে নিয়োগ পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেন-

إن فيما سقت السماء أو تسقى غيلا العشر و فيما سقى بالعرب والدلية نصف العشر

"মুসলমানদের জমি হতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করবে। এ রাজস্ব সে জমি হতে গ্রহণ করা হবে, যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিকভাবে সিক্ত হয়, কিন্তু যে সব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে বালতি, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদি দ্বারা পানি দিতে হয় তা হতে এক-দশমাংশের অর্ধেক- (বিশ ভাগের এক ভাগ) রাজস্ব বাবদ আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে হেমইয়ার-এর রাজার নিকট প্রেরিত ফরমানেও রাসূল (স) বলেছিলেন, "আল্লাহ এবং তার 'রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর, নামায পড়, যাকাত দাও, গণীমতের মাল হতে এক-দশমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য আদায় কর। এতদ্ব্যতীত ভূমি রাজস্বও দিতে থাক। যে ভূমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে বিনা পরিশ্রমে ও অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত সিক্ত হয়, তার এক-দশমাংশ ফসল এবং সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সিক্ত জমির বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায় করতে থাক।"

নবী করীম (স) হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা) কে ইয়ামেনের ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলেন এবং খেজুর, গম, যব, আংগুর বা কিশমিশ হতে এক-দশমাংশ বা উহার অর্ধেক রাজস্ব বাবদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধান, গম, ভুট্টা, কিশমিশ ইত্যাদির ন্যায় সবজি ও বাগানের অন্যান্য গাছ গাছালীও এর আওতাভুক্ত। কারণ রাসূল স. বলেছেন- ما أخرجته الأرض فيه العشر "জমিতে যাই উৎপাদিত হবে তাতেই এক-দশমাংশ রাজস্ব ধার্য হবে।"

এমনকি জমির ফসলের ফূল থেকে উৎপাদিত মধুতেও রাজস্ব হিসেবে ওশর আদায় করতে হবে। কেননা রাসূল (স.) মধু থেকেও ওশর আদায় করেছেন।

নিসফুল ওশর

মুসলমানদের ভোগকৃত এক ধরনের জমি আছে যাতে ফসল উৎপন্ন করতে নিজের খরচে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। এ ধরনের জমির উৎপাদিত ফসলে নিসফুল ওশর বা উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ রাজস্ব আদায় করতে হয়। এ সম্পর্কে রাসূল স. এর বাণী-

و فيما سقى بالسوانى نصف العشر

"যে জমি কোন প্রকারের সেচের মাধ্যমে সিক্ত করা হয় তার বিশভাগের একভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব হিসেবে দিতে হয়।"

আমাদের দেশের অধিকাংশ জমি নিসফুল ওশর জাতীয় জমি। অর্থাৎ যেহেতু আমাদের দেশের উৎপাদিত ফসলে সাধারণতঃ কৃষক নিজের তত্ত্বাবধানে পানি সেচ করে, সার ও কীটনাষক ঔষধ প্রদান করে তাই এতে বিশ ভাগের একভাগ রাজস্ব দেয়া ওয়াজিব। তবে আমন ধানও বেশ কিছু ফলফলাদি উৎপাদনে কৃষককে ভূমিতে কোন সেচ করতে হয় না সে সব ফসলে দশভাগের এক ভাগ ভূমি রাজস্ব দিতে হবে।

বর্তমানে জমির যে ভূমি রাজস্ব আমাদের দেশে চালু আছে তা ইসলামী অর্থনীতিতে নিসফুল ওশরের পরিপুরক নয়।

পার্থক্যের কারণ

মুসলমানদেরকে উপরে বর্ণিত দু'ধরনের জমির ওপর ওশর এবং নিসফুল ওশর রাজস্ব প্রদান করতে হয়। এ পার্থক্যের কারণ বর্ণনায় ইসলামী আইনজ্ঞগণ বলেন-

لأن المؤنة تكثر فيه و تقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا

''কারণ শেষোক্ত জমিতে অধিক শ্রম নিয়োগ করতে হয়; কিন্তু প্রথম প্রকার জমি বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিকভাবেই সিক্ত হয় বলে তাতে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়।''

এ সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, যে জমিতে ফসল ফলাতে শ্রম ও ব্যয় কম হয় এবং লাভ বেশী হয় তাতে নবী করীম (স.) গরীবদের পাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। আর যে জমিতে ফসল ফলাতে শ্রম ও ব্যয় বেশি হয় সে জমিতে গরীবদের পাওনার পরিমাণ কম করে দিয়েছেন। জমির মালিকদের প্রতি অনুগ্রহ দেখান হয়েছে আর এটিই যুক্তিযুক্ত।

খারাজ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাকৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হবে তাকে খারাজ বলে।

খারাজের পরিমাণ কি হবে সে ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। তাই খারাজের পরিমাণ ধার্য করার ভার ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত।

সরকার জমির গুণাগুণ বিবেচনা করে সময় ও অবস্থার চাহিদার আলোকে পার্লামেন্টের সাথে আলোচনা করে খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। খারাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাতে কোনভাবেই অমুসলিমদের উপর জুলুম না হয়, সেদিকে রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

এজন্য খারাজের পরিমাণ নির্ণয়ের বেলায় একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি করা যেতে পারে। তারা অমুসলিমদের সকল জমি জরিপ করবেন, কি কি গুণাগুণ সম্পন্ন জমি আছে তার পার্থক্য করবেন, উর্বরতার পার্থক্য দেখবেন, প্রয়োজনীয় চাষের পরিমাণের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এমনকি পানি সেচের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন কোন জমিতে কি পরিমাণ খারাজ (রাজস্ব) নির্ধারণ করলে প্রজাদের উপর অন্যায় হয় না তার একটি সুপারিশ উক্ত কমিটি সরকারকে পেশ করবেন। আর সে আলোকে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

অমুসলিমদের ভূমি রাজস্ব বা খারাজ টাকার মাধ্যমে যেমন গ্রহণ করা যেতে পারে অনুরূপভাবে সরকার ইচ্ছে করলে তা ফসলের মাধ্যমেও গ্রহণ করতে পারেন। তবে খারাজ আদায়ের জন্য এমন সময় নির্ধারণ করবেন যাতে প্রজাদের রাজস্ব আদায়ে কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

ওশর ও খারাজের পার্থক্য

ওশর, নিসফুল ওশর এবং খারাজের মধ্য কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন-

১. খারাজ আদায় করা হয় জমির ওপর এবং ওশর আদায় করা হয় জমির উৎপন্ন ফসল হতে। একাধিক সহোদর ভাইয়ের কোন 'এজমালি' জমি থাকলে এবং তাদের কেউ কেউ ইসলামে দীক্ষিত হলে- তখন ভূমি-রাজস্বও অনুরূপভাবে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমানের অংশ হতে ওশর এবং অমুসলিমের অংশ হতে খারাজ আদায় করা হবে।

মুসলমানদের জমি হতে 'ওশর' এবং অমুসলিমদের জমি হতে 'খারাজ' আদায় করার ব্যাপারে কোনরূপ জোর-জুলুম, অবিচার কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকগণই প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সে জন্য তাদেরকে অন্যান্য দায়িত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পুরণের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে- অর্থ দানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাজেই জমির রাজস্বের দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য হলেও মোটামুটিভাব মুসলমানকেই অধিক পরিমাণে অর্থ দান করতে হয়।

২. 'ওশর' কখনই কোন অবস্থায়ই রহিত হতে পারে না। তার পরিমাণ চির-নির্দিষ্ট তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ নেই। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তা হতে কাউকে নিস্কৃতি দিতে পারেন না। কারণ এটি শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত কিন্তু প্রয়োজন হলে, উপযুক্ত কারণ থাকলে. খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা, এমনকি অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়ার পূর্ণ অধিকারও রাষ্ট্র প্রধানের রয়েছে।

৩. খারাজ বৎসরে একবার আদায় করা হয়, কিন্তু ওশর আদায় করা হয় প্রত্যেক ফসল হতে। বৎসরের মধ্যে যত প্রকারের ফসল যতবার ফলবে, তত প্রকার ফসলের উপর ততবারই 'ওশর' ধার্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১। ভূমি রাজস্ব কত ধরনের ?

ক. ৩ ধরনের; খ. ২ ধরনের;
গ. ৪ ধরনের; ঘ. ৫ ধরনের।

২। ওশর অর্থ কি ?

ক. পাঁচ ভাগের একভাগ; খ. দশ ভাগের একভাগ;
গ. বিশ ভাগের একভাগ; ঘ. চার ভাগের একভাগ।

৩। বছরে কতবার খারাজ আদায় করা যাবে ?

ক. যতবার ফসল হয় ততবার; খ. একবার মাত্র;
গ. দুই বার; ঘ. তিন বার।

৪। খারাজের পরিমাণ কে নির্ধারণ করবেন ?

ক. মহান আল্লাহ; খ. রাসূল (স.);
গ. রাষ্ট্রপ্রধান / সরকার; ঘ. তহশিলদার।

৫। কোন শ্রেণীর লোকদের জমির রাজস্বকে নিসফুল উপর বলে?

ক. হিন্দুদের জমির রাজস্বকে; খ. মুসলিমদের জমির রাজস্বকে;
গ. অমুসলিমদের জমির রাজস্বকে; ঘ. খ্রীষ্টানদের জমির রাজস্বকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ভূমি রাজস্ব বলতে কী বুঝায় ? সংক্ষেপে লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি কত প্রকার ? ওশরী জমি ও খারাজী জমি বলতে কী বুঝায় ? বর্ণনা করুন।
৩. ওশর কি ? কী ধরনের জমিতে ওশর ওয়াজিব হয় ?
৪. নিসফুল ওশর কী ? কি ধরনের জমিতে নিসফুল ওশর ওয়াজিব হয় ?
৫. ওশর ও খারাজের মধ্যে পার্থক্য কী ? সংক্ষেপে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খারাজ কি ? খারাজ নির্ধারনের ক্ষেত্রে কি নীতিমালা অনুসরণ করা উচিৎ ? বর্ণনা করুন।
২. জমি থেকে আদায়কৃত রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ৪

ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- যাকাত বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- যাকাতের উদ্দেশ্য কী তা লিখতে পারবেন;
- যাকাত কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কার নিকট থেকে যাকাত আদায় করা হবে তা বলতে পারবেন;
- যাকাতুল ফিতর কী এবং এটি কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে তা বলতে পারবেন।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত অত্যন্ত সুপরিচিত একটি শব্দ। ইসলামের ৫টি মূলভিত্তির একটি হচ্ছে যাকাত। আভিধানিকভাবে শব্দটি বরকত, প্রবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনীদের মাঝে যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক তাদের সম্পদের সুনির্দিষ্ট একটা অংশ গরীবদের জন্য দান করা আল্লাহ তা'আলা বাধ্য করে দিয়েছেন। এটা গরীবদের অধিকার। ধনীদের সম্পদে গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট এ অংশের নাম যাকাত।

যাকাত একটি অর্থনৈতিক ইবাদাত। সকল মানুষের উপর এটি আদায় করা জরুরী নয়। শুধু ধনীদের বেলায় যাকাত প্রযোজ্য।

সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে যাকাতদাতা তাতে বরকতের আশা পোষণ করে থাকেন, এর ফলে তার আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে এবং যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদে প্রবৃদ্ধি ঘটে বিধায় এর নাম যাকাত হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

যাকাতের শরয়ী ভিত্তি

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উপর যাকাত আদায় করা যেমনিভাবে ফরয অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর যাকাত আদায় করে তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে যাকাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা চালানো কর্তব্য। যাকাত ফরয হবার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

"মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু; এরা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (সূরা আত-তাওবা : ৭১)
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন-

إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم

"আল্লাহ তা'আলা ধনী মুসলমানদের সম্পদে এতটুকু পরিমাণ যাকাত আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন যা তাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট হয়।" (তাবারানী)

ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক ধনী মুসলমানের উপর স্বীয় সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা ফরয। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থবিভাগেরও দায়িত্ব ধনী মুসলমানদের থেকে যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

আল্লাহ তাআলা সূরা হজ্জের ৪১ নম্বর আয়াতেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের উপর যে সকল কাজ করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন তার মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম।

রাসূল (স) একবার মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি তাকে সেখানকার অধিবাসীর জন্য যে সকল কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেখানকার ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করা। দীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেন-

فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنياءهم و ترد إلى فقراءهم

"তারা যদি এ সকল কাজের অনুসরণ করে তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। এ যাকাত তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

উল্লেখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, যে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) উভয়ই এ ব্যবস্থার প্রবর্তক।

যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত ব্যবস্থা একটি দূরদর্শী ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে যে সকল উদ্দেশ্য আছে বলে প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে,

১. সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এটাই হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। রাসূল (স) বলেন,

توخذ من أموالهم و ترد إلى فقراءهم

''তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে তা বিতরণ করবে।'' (আবু দাউদ)

২. যাকাত ব্যবস্থার ফলে মানুষের সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধিত হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি পায় আর গরীবরা সচ্ছছল হযে উঠে।

৩. যাকাত ধনীদের আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করে। যাকাত আদায়ের ফলে ধনীর মন থেকে কার্পণ্য ভাব দূরীভিত হয়। তার মন দয়ালু হয়ে ওঠে। সমাজের অভাবী মানুষের প্রতি সে সহানুভুতিশীল হয়ে উঠে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।" (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

৪. যাকাত ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। এর ফলে ধনীদের প্রদত্ত অর্থ যখন গরীবের হাতে চলে আসে তখন তারা এ অর্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে, ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মালের যোগান বেশী হয়। এতে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

৫. যাকাত ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণরত ব্যক্তিদের সামাজিক সমস্যা লাঘব করে। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ও সমস্যাগ্রস্থ মুসাফির যাকাতের অন্যতম দু'টি খাত।

৬. ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করণ এবং ইসলামী আদর্শকে প্রচার ও প্রসারের কাজ করা। এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা মেটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা যাকাত ব্যয়ের একটি খাত নির্ধারণ করেছেন।
অর্থাৎ যাকাতের সম্পদ তাদের (কাফিরদের) মন ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যয় করা হবে।

৭. বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখা যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করার চেয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের নির্দিশ দিয়েছেন এবং যাকাত আদায়কারী কর্মচরীদের বেতন প্রদানের জন্য যাকাতের নির্দিষ্ট খাত রেখেছেন। আর এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ।

এক কথায় বলা যায়, অর্থনৈতিক মুক্তির এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন।

যাদের থেকে যাকাত আদায় করা যাবে

প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। ইবাদাত হিসেবে তার নিজের পক্ষ থেকেই যাকাত আদায়ের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের ব্যক্তি থেকে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

এমনকি পাগল মুসলমান ও যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবেন।

নিসাব পরিমাণ সম্পদ

ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন যেমন খাদ্য, বস্ , বাসস্থান, যানবাহন ও নিজের পেশাগত কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ যদি শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ হয় যার উপর উপর যাকাত ফরয হয় সে পরিমাণ সম্পদকে নিসাব বলে। তবে শর্ত হল এ সম্পদ ব্যক্তির নিকট কমপক্ষে এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। যদি উক্ত সম্পদ তাঁর নিকট এক বছরের কম সময় থাকে তবে তাতে যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়। ইসলামী রাষ্ট্রও তার থেকে যাকাত আদায় করতে পারবে না। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং বছরের শেষ দিকেও মালিক থাকেন কিন্তু বছরের মাঝামাঝি কোন সময় সম্পদ নিসাব পরিমাণ থেকে কমে যায় তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন-

لا زكاة فى مال لايحول عليه الحول

''সে সম্পদের কোন যাকাত দিতে হবে না যা মালিকের কাছে এক বছর অতিবাহিত হয়নি।''

যে সব সম্পদে যাকাত দিতে হয়

কোন ব্যক্তি যদি নিম্নলিখিত সম্পদের যে কোন একটির কিংবা একাধিক বস্তুর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে তার থেকে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে। সাধারণত সোনা, রূপা, শষ্য, ফলমূল, ব্যবসায়িক পণ্য, মাঠে চরে বেড়ায় এমন পশু, খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধনে যাকাত ওয়াজিব হয়।

সোনা রূপার নিসাব

সোনার নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত তোলা। আর রূপার নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা সোনার মালিক হন (৮৫ গ্রাম) কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হন আর তা এক বছর পর্যন্ত তার মালিকানাধীন থাকে তবে তাকে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। এর পরিমাণ যতই বাড়বে বর্ণিত যাকাতের হার তার হিসেবে বাড়তে থাকবে।

প্রচলিত মুদ্রার যাকাত

বর্তমান যুগে সোনা বা রূপার মুদ্রা নেই বললেই চলে। আছে কাগজের মুদ্রা ও পয়সা। এসব কাগজের মুদ্রা বা পয়সা ইত্যাদি সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত। তাই প্রচলিত মুদ্রার উপর যাকাত ফরয হবে। বৈদেশিক মুদ্রার

মালিক হলে তা মুদ্রায় হিসেব করে যাকাত আদায় করতে হবে। এ ধরনের সম্পদ নিজের ঘরে থাকুক কিংবা ব্যাংকে গচ্ছিত থাকুক যাকাত আদায় করতে হবে।

নগদ অর্থ (টাকা পয়সা) যেহেতু সোনা-রূপার স্থলাভিষিক্ত তাই কারো কাছে যদি সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান অর্থ থাকে এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

বর্তমানে যেহেতু রূপার তুলনায় সোনার ব্যবহার ও লেনদেন বেশী তাই সোনার হিসেবে নগদ অর্থের নিসাব ধার্য করাই যুক্তিসংগত হবে, যদিও কোন কোন ফিকাহবিদ মনে করেন যে, সোনা এবং রূপার মধ্য থেকে যেটির হিসেব করলে প্রথমে যাকাত ওয়াজিব হয় সেটির হিসেবে টাকা-পয়সার উপর যাকাত ধার্য হবে। কারণ এতে গরিবদের সুবিধা রয়েছে।

মহিলাদের অলংকারের যাকাতঃ

মহিলাদের অলংকার যদি উন্নতমানের হীরা, মুক্তা, পান্না ও পাথরের তৈরি হয় তাতে যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে অংলংকার যদি সোনা কিংবা রূপার হয়, এবং তা নিসাব পরিমাণ হয় তাতে যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূল (স.) বলেছেন-

قل نساء المسلمين يزكين عن حليهن

"মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন তারা যেন তাদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত আদায় করে।"

রাসূল (স.)-এর সামনে একদা আসমা বিনতে ইয়াযিদ তার খালাসহ প্রবেশ করলে তিনি তাদের হাতে স্বর্ণালংকার দেখে বললেন, তোমরা কি এর যাকাত দাও ? তারা বললেন, না। রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের চুড়ি পরিয়ে দিবেন- তোমরা কি এ বিষয়টি ভয় কর ? যদি ভয় করে থাক তবে এ অলংকারের যাকাত আদায় কর। (মুসনাদে আহমদ)

ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব

ব্যাবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে নিসাব ধার্যের নিয়ম হল বছরের শুরুতে যে পরিমাণ পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হবে তা যদি নিসাব পরিমাণ অর্থের সমান হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে। এবং বছরের মাঝখানে যে সকল পণ্য দোকানে ওঠানো হয় তাতে তখনই যাকাত আদায় করতে হবে যখন তার উপর এক বছর পূর্ণ হবে এর পূর্বে যাকাত দিতে হবে না। এভাবে প্রতি বছর শেষে ব্যবসায়িক পণ্যকে ব্যবসার মূলধন ধরতে হবে এবং তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

ভাড়া প্রদানকৃত বাড়ির উপর যাকাত

কোন ব্যক্তি যদি বাড়ি নির্মাণ করে তা ভাড়া দেয় এবং তা দ্বারা ব্যবসা করে তারও যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ, তখন বাড়িটি তার থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নয় বরং অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম।

ফল-ফুল ও শস্যের যাকাত ও নিসাব

জমিতে যে সকল ফলমূল শস্য উৎপাদন করা হয় তার যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূল (স.) এর আমলে গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের যাকাত আদায় করা হত। তিনি বলেন-

ما أخرجة الأرض ففيه العشر

''জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হবে তার এক দশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে।''

ফলমূল ও শষ্যের নিসাবের পরিমাণ ৫ ওয়াসক বা ২৬ মন ১০ সের। এর কম হলে যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়। এ ধরনের সম্পদে জমি অনুযায়ী ওশর বা এক দশমাংশ কিংবা নিসফুল ওশর বা এক বিশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে। (৩য় পাঠে এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে)

পশুর যাকাত

যে সকল মালিকানাধীন পশু বছরের অধিকাংশ সময় মালিকের তত্ত্বাবধান ছাড়া মাঠে চরে বেড়ায় এ ধরনের উট, গরু, ছাগল, ভেড়ার যাকাত আদায় করতে হবে। এগুলোকে সায়েমা (سائمة) (বিচারণকারী) পশু বলে। এগুলোর নিসাবের পরিমাণ হল উট ৫টি, গরু ৩০টি আর ছাগল ভেড়া ৪০টি। এ সংখ্যার কম হলে যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

যাকাত আদায় প্রক্রিয়া

যাকাত একটি ইবাদাত। ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তির একটি। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় সম্পদের হিসেব করে নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে ব্যয় করে তবে তার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

তবে যাকাতের পরিমাণ সম্পদ পৃথক করে তা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করাই সঠিক ও উত্তম পন্থা। কেননা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে যতটা যাকাতের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্জন করা যাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা দিলে। এর মাধ্যমে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।
আল্লাহ তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্রর কাছে যাকাত হস্তান্তরের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। রাষ্ট্র কর্তৃকক্ষকে তিনি বলেছেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

''আপনি তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করুন। যাতে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।'' (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

সকল ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদানে এগিয়ে আসবে না। আর এটাই স্বাভাবিক। তাই ইসলামী রাষ্ট্রকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায়ের জন্য একটি আলাদা বিভাগ গঠন করবে। নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীরা যাকাত আদায়ের জন্য এমন পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার ফলে প্রকাশ্য সম্পদ যেমন, শষ্য, ফল, গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং অপ্রকাশ্য সম্পদ যেমন, সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায় পণ্য ইত্যাদির যাকাত সঠিক পরিমাণে আদায় করা যায়।

যাকাতের ব্যয়

ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায় করার পর তা অন্যান্য ট্যাক্স এর সঙ্গে মিলাতে পারবে না বরং যাকাত ফান্ডের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করবে। আর এ অর্থ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ৮টি খাতে প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে হবে। এ খাত ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় করার সুযোগ নেই। (যাকাত ব্যায়ের খাতসমূহ ২য় পাঠে আলোচিত হয়েছে)।

যাকাত সম্পর্কে নীতিগত কথা হচ্ছে, এটা কোন ট্যাক্স নয়। মূলত, এটা অর্থনৈতিক ইবাদাত মাত্র। ট্যাক্স ও ইবাদাতের মৌলিক ধারণা ও নৈতিক ভাবধারার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কাজেই যাকাতকে কোন ক্রমেই যেন ট্যাক্স মনে করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের অন্যতম দায়িত্ব।

যাকাতকে রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করার কারণেও কারো মনে উক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া আদৌ উচিত নয়। কেননা, মুসলমানদের সকল প্রকার সমষ্টিগত ইবাদাত বন্দেগির নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। তাই অর্থনৈতিক ইবাদাত-যাকাত-আদায়কেও তারই একটি খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যাকাতের যে হার নবী করীম (স) ইসলামী শরীআতের বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী নির্ধারণ করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু টেক্স এর পরিমাণে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বৈধ। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় যাকাতের হার স্বল্প মনে করে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা আল্লাহর শরীয়াতের উপর হস্তক্ষেপ এবং বড় অপরাধ বলে গণ্য হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সে জন্য এ মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত হয়ে আসছে।

فى مالك حق سوى الزكوة

''তোমার ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও (সমাজের) অধিকার রয়েছে।'' (কিতাবুল আমওয়াল)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. যাকাত আদায় করা কোন ধরনের কাজ ?

ক. একটি কর বিশেষ; খ. একটি অর্থনৈতিক ইবাদাত;
গ. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া একটি ট্যাক্স; ঘ. একটি শারীরিক ইবাদাত।

২. টাকা-পয়সার শতকরা কতভাগ যাকাত দিতে হবে ?

ক. শতকরা পাঁচ ভাগ; খ. শতকরা আড়াই ভাগ;
গ. শতকরা দশ ভাগ; ঘ. শতকরা বিশ ভাগ।

৩. যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল-

ক. দারিদ্র্য বিমোচন করা; খ. ইসলামের প্রসার ও প্রচার;
গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা; ঘ. উল্লেখিত সব কটি উত্তরই সঠিক।

৪. যেসব বাড়ী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য তৈরী করা হয় তাতে যাকাত আদায়ের হুকুম কি ?

ক. যাকাত আদায় করা ওয়াজিব; খ. ওয়াজিব নয়;
গ. উত্তম কাজ; ঘ. যুক্তিসংগত।

৫. স্বর্ণের নিসাব কি ?

ক. সাড়ে বায়ান্ন তোলা; খ. সাড়ে বত্রিশ তোলা;
গ. সাড়ে সাত তোলা; ঘ. দশ তোলা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাত কাকে বলে ? কেন যাকাতকে যাকাত বলা হয় ?
২. যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী কী? লিখুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্র কোন ব্যক্তি থেকে যাকাত আদায় করবে ? বর্ণনা করুন।
৪. কোন কোন সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে? লিখুন।
৫. যাকাত আদায়ের সঠিক প্রক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ ? আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. যাকাত আদায়ের শরঈ ভিত্তি কী ? যাকাত কে আদায় করবে এবং কেন? লিখুন।
২. যাকাত কোন কোন মাল থেকে আদায় করা হয়? প্রত্যেকটির নিসাবের পরিমাণ কি বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ৫

ইসলামী রাষ্ট্রের কর ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ কর ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- ◆ ইসলামের কর ব্যবস্থা কতটা জনহিতকর তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ কি ধরনের কর ইসলামী রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য তা বলতে পারবেন।

কর ব্যবস্থা

প্রতিটি রাষ্ট্রের উপর মৌলিক কতগুলো দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। এ সকল দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যেহেতু রাষ্ট্র ও সরকার জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনের ব্যয়ভারও জনগণকেই বহন করতে হয়। জনগণ থেকেই উক্ত অর্থ আদায় করা হয়। রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদন এবং নাগরিকদের কল্যাণের জন্য নাগরিকদের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করা হয় তাকে কর বলে।

এ কর ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে যেমন বিদ্যমান রয়েছে ইসলামের স্বর্ণযুগেও তা ইসলামী রাষ্ট্রে কার্যকর ছিল এবং ভবীষ্যতেও যেখানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এ ব্যবস্থা কাযকর থাকবে।

কারণ কর জনগণের উপর কোন বোঝা নয়। বরং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ফান্ডে অর্থ জমা দেয়ার নামই হচ্ছে কর। কোন মানুষ নিজের বাহ্যিক কোন প্রয়োজনে অর্থ খরচ করা যেমন বোঝা মনে করে না অনুরূপভাবে পরোক্ষভাবে করও তার নিজের প্রয়োজনেই ব্যয় করা হয়ে থাকে, তাই করকেও বোঝা মনে করা উচিৎ নয়।

কর ব্যবস্থার ইসলামী আইনগত ভিত্তি

অনেক প্রকার কর রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভূমি কর। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"হে মুমিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।" (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ.

"এর ফল আহার করবে আর ফল তোলবার দিনে এর হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবেনা; নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আন'আম : ১৪১)

রাসূল (স.) বলেন-

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر و فيما سقى بالسوا نى والنضح نصف العشر

যে জমি বৃষ্টি, ঝর্ণাধারা বা নদীর পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যা নিজে নিজেই সিক্ত থাকে সে জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং যে জমি বিভিন্ন উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সিক্ত করা হয়, তার ফসলের বিশভাগের একভাগ ভূমি কর হিসেবে দিতে হবে। (আবু দাউদ)

জিযিয়া করের বেলায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

"যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।" (সূরা আত-তাওবা : ২৯)

হযরত উমর (রা) তার শাসনামলে আমদানী কর ধার্য করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে নূন্যতম একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

উল্লেখিত প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্ধারণ করার জন্য কর নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন নির্দেশ করেছেন তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদূন তা বাস্তবায়ন করেছেন।

করনীতি

ইসলামী রাষ্ট্র কর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত জনকল্যাণকর নীতিসমূহ অবলম্বন করতে পারবে। তবে যে বিষয়গুলো মৌলিকভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে, করের পরিমাণ এমন হতে পারবে না যার ফলে সমাজের কোন এক শ্রেণীর মানুষের ওপর তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। করের আয় শুধু দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বায়তুলমালেই জমা হবে, কোন ক্রমেই করের অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যেন বিলাস বহুল জীবন যাপনে ব্যয় না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর এ বাণীকে স্মরণ করা উচিৎ-

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإِحْسَانِ

''আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দিচেছন।'' (সূরা আন-নাহাল : ৯০)

করের শ্রেণীবিভাগ

কর নির্ধারণের প্রকৃতি ও ধরনের দিক বিচার করলে সাধারণতঃ কর দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. প্রত্যক্ষ কর
২. পরোক্ষ কর

প্রত্যক্ষ করের পরিচয়

যে রাজস্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা অবস্থার লোকদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী ধার্য করা হয়, তাকে 'প্রত্যক্ষ কর' বলে। যেমন- ফসলের উপর এক দশমাংশ বা এক বিশমাংশ ধার্যকৃত কর। এ কর দ্বারা করদাতা নিজেই প্রভাবিত হয়। এর প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে না।

পরোক্ষ করের পরিচয়

যে কর সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের উপর ধার্য করা হয় কিন্তু মূলতঃ এর সবটি কিংবা অংশ বিশেষ পরিমাণ পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে আদায় করতে হয় অর্থাৎ কর ধার্য করার ফলে করদাতার চেয়ে জনসাধরণ বেশি প্রভাবিত হয়। তাকে বলা হয় পরোক্ষ কর। যেমন- আয় কর, বর্তমানে আরোপিত ভ্যাট ইত্যাদি। এজাতীয় কর ধার্য করা হয় আয়কারীর উপর কিন্তু পরোক্ষভাবে করদাতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনসাধারণ থেকে তা আদায় করে নেয়।

কর আদায়ের খাতসমূহ

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করার জন্য যে সকল খাত থেকে কর আদায় করা যাবে তা হচ্ছে-

১. ভূমি কর
২. জিযিয়া কর
৩. আমদানী-রপ্তানী কর
৪. আয় কর
৫. জরুরী প্রয়োজনে কর

৬. সামরিক কর
৭. বনজ ও সমুদ্র সম্পদের কর।

ভূমি কর

ভূমি কর সম্পর্কে ৩য় পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ করের মধ্যে প্রথমত ওশর (একদশমাংশ) নিসফুল ওশর (এক বিশমাংশ) ও খারাজ উল্লেখযোগ্য।

জিযিয়া কর

জিযিয়া কর সম্পর্কেও ১ম পাঠে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটু বিস্তারিতভাবে জিযিয়া কর সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম অধিবাসীদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি বিশেষ কর গ্রহণ করা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক পরিভাষায় যাকে 'জিযিয়া কর' বলে। 'জিজিযা' অর্থ 'বিনিময়'। রাষ্ট্র তার প্রজা-সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে যে নিরাপত্তা দান করে, রাষ্ট্র তারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমাণে কর আদায় করার অধিকার লাভ করে থাকে। 'জিযিয়া' অনুরূপ একটি কর। তা সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্য করা হয়। কুরআন মাজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছেঃ

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ .

"যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।" (সূরা আত-তাওবা : ২৯)

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানত দু'টি কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত রাষ্ট্রের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ধার্যকৃত কর প্রদান করা।

একটি সুবিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আধুনিক যুগে কোন কোন মহল ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর জিযিয়া কর ধার্যকরণকে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি বলে বর্ণনা করতে চান। তারা বলতে চান যে, এটা একটি অবিচার পূর্ণ আচরণ।

কিন্তু সঠিক চিন্তা ও যুক্তির নিরিখে তাদের উক্ত বক্তব্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি কারণে প্রমাণিত হয় যে, জিযিয়া কর একটি সুবিচারমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ

রাষ্ট্র হল সুসংগঠিত একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশের রক্ষণাবেক্ষণ নীতিগতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাসী (মুসলিম) নাগরিকদের উপর ন্যস্ত হয়, অবিশ্বাসী (অমুসলিম) লোকদের উপর নয়। রাষ্ট্রের উপর কোনরূপ বহিরাক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার জন্য সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার দায়িত্ব দেশের সমগ্র মুসলিম জনসাধারনের উপর বর্তায়, অমুসলিমদের উপর ততটা এ দায়িত্ব বর্তায় না।

এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিকট হতে দেশরক্ষার খাতে একটি বিশেষ কর আদায় করার নীতি অবলম্বন করেছে। তাই এ ব্যবস্থাকে 'সুবিচারপূর্ণ কর নীতি' বলা যেতে পারে। কারণ, এর ফলে দেশরক্ষার ব্যাপারে মুসলিমগণ জনশক্তি (man power) সরবরাহ করবে, আর দেশের অমুসলিমগণ আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এরূপ নীতি অবলম্বন করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান দায়িত্ব উক্ত আদর্শে বিশ্বাসীদের উপর ন্যস্তকরণ বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য।

বস্তুত সকল প্রকার সচ্ছল মুসলমানের উপরই যাকাত আদায় করা যখন ফরয তখন অমুসলিমদের উপর একমাত্র 'জিযিয়া' কর আদায়ের নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হয় নি, তা অতি সহজেই বোধগম্য।

যে সকল অমুসলিমের উপর জিযিয়া কর প্রযোজ্য

'জিযিয়া' কিংবা অনুরূপ কর কেবল সেসব লোকের নিকট হতে আদায় করা হবে, সাধারণত যাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এবং সে সঙ্গে এ কর প্রদানের সামর্থ্যও রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অনুরূপ ক্ষমতা নেই-যেমন স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম, বৃদ্ধ, পাগল, অন্ধ ও পংগু লোক কিংবা যারা নীতিগতভাবে যুদ্ধ বিমুখ বা যুদ্ধবিরোধী যথা পাদ্রী, পুজারী, ঠাকুর, গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি। তাদের উপর এ ধরনের কোন করই ধার্য করা হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদের উপর আরোপিত জিযিয়া করকে শুধু জিযিয়াই বলতে হবে ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজনে এ করকে অন্য নামেও নামকরণ করা যেতে পারে। আর অমুসলিমরা যদি জিযিয়া কর প্রদান করাকে অবিচারপূর্ণ আচরণ মনে করে থাকে তাহলে তারা ইচ্ছে করলে জিযিয়া না দিয়ে মুসলমানদের মত যাকাতের পরিমাণ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে পারে।

মূলত ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অনুগত অমুসলিম নাগারিকের নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। তাই যদি ইসলামী রাষ্ট্র কোন অমুসলিম নাগরিকের রক্ষণবেক্ষণে সক্ষম না হন তবে তাদের নিকট হতে মোটেই জিযিয়া কর আদায় করা যাবে না এমনকি যদি জিযিয়া গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাও ফেরৎ দিতে হবে।

জিযিয়া করের পরিমাণ

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান তার পরামর্শ সভার সাথে পার্লামেন্টে আলোচনা সাপেক্ষে সময় কাল ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিযিয়া করের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু কোন বক্তব্য নেই। তবে জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধানের কাজ রাষ্ট্র-সরকার ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই সঠিক ইসলামী পন্থা। প্রত্যেক ধনশালী উপার্জনশীল ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন- এ উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে দাতা ও গ্রহীতা কারো প্রতি যাতে বিন্দুমাত্র অবিচার না হয় সেদিকে উভয়কেই তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

কি বস্তু জিযিয়া কর হিসেবে দেওয়া যায়

জিযিয়া সাধারণত টাকায় আদায় করা হবে। কিন্তু পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশেষ কোন শিল্পপণ্যের আকারেও তা আদায় করা যেতে পারে। নবী করীম (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদুন বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট হতে জিযিয়া বাবদ শিল্পপণ্যও গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন-

إن الجزية غير مقدرة الجنس والقدر

''জিযিয়ার পরিমাণ কি হবে এবং কিসের মাধ্যমে তা আদায় করা হবে, তা শরীআত নির্ধারণ করে দেয়নি।'' জিযিয়া বছরে মাত্র একবারই আদায় করা হবে, তার অধিক নয়। এ ব্যাপারে নবী করীম (স.)-এর নিম্নলিখিত বাণীটি একটি চূড়ান্ত ঘোষণা।

و من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقة فأنا حجيجه

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম সংখ্যালঘুর) প্রতি জুলুম করবে কিংবা তাদের সামর্থ্যের অধিক কোন বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিবে, (কিয়ামতের দিন) আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব।"

আমদানী ও রপ্তানী কর

প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের দেশে উৎপাদিত শিল্পপণ্যের উন্নতি সাধন করতে তৎপর। আবার যে সকল পণ্য নিজের দেশে উৎপাদিত হয় সেগুলো বিদেশ থেকে আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করে। কারণ, আমদানী বন্ধ না করলে নিজের দেশের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারে বিক্রির হার কমে যাবে। দেশীয় পণ্য উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হবে এবং এর অগ্রযাত্রা হ্রাস পাবে।

তাই সাধারণত বিদেশী পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কর ধার্য করা হয়। ফলে দেশের বাজারে তা দেশীয় পণ্যের মত কম মূল্যে বিক্রি করা যায় না যার ফলে বিদেশী পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যায়। বিদেশী পণ্যের উপর অর্পিত এ করকে আমদানী কর বলে।

ইসলামী রাষ্ট্রও এ ধরনের কর আরোপ করতে পারে। হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে এ ধরনের কর ধার্য করেছিলেন।

এমনিভাবে দেশের যে সব পণ্য বিদেশে সহজে রপ্তানী হলে নিজের দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সে সব পণ্যের রপ্তানী রোধ করতে যে কর নির্ধারণ করা হয় তাকে রপ্তানী কর বলে।

এ ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে চায়, তবে তাকে এক ধরনের কর প্রদান করতে হয়। তাও আমদানী করের আওতায় পড়বে।

আমদানী ও রপ্তানী করের পরিমাণ

এ ধরনের করের পরিমাণ ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের উপরই বিষয়টি ন্যস্ত। অবস্থার প্রেক্ষাপটে আলোচনা সাপেক্ষে আমদানী-রপ্তানী কর ধার্য হবে। সব সময়ের জন্য করের পরিমাণ এক হওয়া শর্ত নয়। আবস্থার আলোকে তা পরিবর্তনশীল।

সরকার প্রয়োজন বোধ করলে দেশী পণ্যের বিক্রয়ের উপরও কর আরোপ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরী।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পণ্য সামগ্রীর প্রচলন, এক স্থান হতে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানী করার উপর কোনরূপ কর ধার্য হবে না। এ নিয়মে কোনরূপ রদ-বদল করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের রপ্তানীকৃত পণ্য সামগ্রীর উপর যদি বিদেশীরা কর ধার্য করে তখনই ইসলামী রাষ্ট্রও সকল প্রকার বিদেশী শিল্প-পণ্যের উপর অনুরূপ হারে শুল্ক ধার্য করে দিবে।

আয়কর

আধুনিক রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির মাসিক অথবা বাৎসরিক আয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ হলে তাকে শতকরা হারে একটা নির্ধারিত কর প্রদান করতে হয়, যাকে আয় কর বা ইনকাম ট্যাক্স বলা হয়।

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত অনেকটা আয়করের মত, তবে যাকাত ইবাদাত আর আয়কর ইবাদাত নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূল (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শ রাষ্ট্রের কোন আয়কর ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও অবস্থার আলোকে প্রয়োজন হলে ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের কর আরোপ করতে পারবে এতে শরীঅতের মূলনীতির পরিপন্থি কিছু নেই।

জরুরী প্রয়োজনে কর

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যদি সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে পড়ে ; কিংবা ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ কমে যায় অথবা জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যেমন নতুন কোন জাতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য-অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথবা বিভিন্ন প্রকার আয়ের পরেও রাজ্যের সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব না হয় ; বা বন্যা, ক্ষরা দেখা দেয় অথবা দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে ইসলামী রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর আরো অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবে। প্রখ্যাত ইসলামী রাজনীতিবিদ ইমাম মাওয়ার্দী 'আল-আহকামুস সুলতানীয়া' গ্রন্থে বলেন, জরুরী অবস্থায় সকল প্রকার ব্যয় বহনের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমানদের উপরই বর্তাবে। প্রয়োজনের সময় তাদের নিকট হতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ আদায় করা যাবে।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী করীম (স.) যাকাত, ওশর ইত্যাদি আদায় করার পরও আকস্মিকভাবে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করেন ফলে মুসলমানদের নিকট তিনি সে জন্য অর্থ সাহায্যের দাবি পেশ করেন। হযরত উমর ও উসমান (রাঃ) এ সময় তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদের অর্ধেক দান করেছেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সম্পূর্ণ বিত্ত-সম্পদ এনে নবী করীম (স.)-এর খিদমতে পেশ করেন।

জরুরী অবস্থায় যে কর ধার্য করা হয় তা দুই প্রকার

১. এমন কর, যা সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য ধার্য করা হয়।

২. এমন কর, যা অত্যাচারী শাসক কেবল তার বিলাসিতা ব্যয়ের জন্য আদায় করে থাকে এবং প্রকৃত জনস্বার্থের সাথে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আলোচ্য দুই প্রকার কর কখনো সাময়িকভাবে ধার্য করা হয়, আবার কখনো কখনো স্থায়ীভাবেও ধার্য হয়ে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে ২য় প্রকার করের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু প্রথম প্রকারের কর ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। এরূপ কর কোন ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ন্যায়সঙ্গতভাবে ধার্য করা হলে তা প্রদান করা নাগরিকদের একান্ত কর্তব্য। কারণ, এটা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর সকল আদেশ পালন করা সকল নাগরিকরেই কর্তব্য।

কিন্তু অন্যায়ভাবে জনস্বার্থ হানিকর কোন কাজের জন্য যদি অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা হয় তবে তা প্রদান করা মুসলমানদের কর্তব্য নয়। কারণ এ ধরনের ট্যাক্স ধার্য করা সম্পর্কে নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ "অতঃপর জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা শাসকদেরকে জাতি ও জনগণের সংরক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়ার আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে এ জন্য নিয়োগ করা হয় নি যে, তারা জাতি ও দেশবাসীকে নতুন নতুন কর ভারে জর্জরিত ও নিঃস্ব করে দেবে।"

মুসলমানগণ এ ধরনের কর কেবল প্রদান না করেই ক্ষান্ত হবে না বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও তাদের জন্য আবশ্যক।

সামরিক কর

উপারে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের কর দ্বারা রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। আর বায়তুলমালে অর্থ মওজুদ থাকা অবস্থায় জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা এমনকি যুদ্ধের জন্য হলেও উচিৎ নয়।

এরপরও কখনও যদি দেশের স্বাধীনতা সার্বভোমত্ব হুমাকির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের প্রয়োজন হয় এবং বায়তুলমালের অর্থ শেষ হয়ে যায় তবে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের উপর সামরিক কর ধার্য করা যেতে পারে। আর জনগণ বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের বিষয়ে আপত্তি করবে না-এটাই স্বাভাবিক।

বন-সম্পদ ও সমুদ্র-সম্পদের উপর কর

ইসলামী রাষ্ট্রের বন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় একটি উল্লেখযোগ্য আয়ের মাধ্যম। এটা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন থাকবে এবং এর যাবতীয় আয় রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হবে।

এছাড়া সকল প্রকার সামুদ্রিক সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উপায়। সামুদ্রিক সম্পদ-বিশেষ করে মৎস্য ও মুক্তার উপর কর ধার্য হতে পারে। হযরত উমর (রা.) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করা এবং তা যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। কোন এক কর্মচারীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সমুদ্র হতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য হতেই রাজস্ব বাবদ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে, কারণ এটাও আল্লাহ তা'আলারই একটি দান। নদী, ঝিল, বিল ইত্যাদি হতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে যে মৎস্য উৎপাদন হবে তার এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের জমা হবে। হযরত আলী (রা.) এর সূত্রপাত করেছিলেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এমত পোষণ করতেন।

কর ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে যেমন স্বীকৃত ইসলামী অর্থনীতিতেও এটা একটি বৈধ ব্যবস্থা। জনগণের উপর অর্থনৈতিক নির্যাতনের সম্ভাবনা না থাকলে এবং ইসলামী শরীআতের মূলনীতির বিপরীত না হলে ইসলামী রাষ্ট্র ও আধুনিক যুগের প্রবর্তিত অনেক প্রকার কর আরোপ করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কর সাধারণত কত প্রকার ?

ক. ২ প্রকার; খ. ৩ প্রকার;
গ. ৪ প্রকার; ঘ. ৫ প্রকার।

২. জিযিয়া করের পরিমাণ কে নির্ধারণ করেন ?

ক. আল্লাহ তা'আলা; খ. রাসূল (স.);
গ. ইসলামের বিভিন্ন ইমামগণ; ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের পরামর্শ সভা।

৩. জিযিয়া কর কী ধরনের কর ?

ক. একটি নির্যাতনমূলক কর ব্যবস্থা; খ. একটি বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা;
গ. একটি সুবিচারমূলক কর ব্যবস্থা; ঘ. একটি আধুনিক কর ব্যবস্থা।

৪. সমুদ্র সম্পদে কী পরিমাণ কর দিতে হয় ?

ক. এক দশমাংশ; খ. এক পঞ্চমাংশ;
গ. এক বিশমাংশ; ঘ. কিছুই দিতে হয় না।

৫. বনজ সম্পদের কী পরিমাণ রাজস্ব খাতে দিতে হবে ?

ক. কোন কিছুই রাজস্ব খাতে দিতে হবে না; খ. সবটাই রাষ্ট্রকে দিতে হবে;
গ. এক দশমাংশ রাষ্ট্রকে দিতে হবে; ঘ. এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রের কর ব্যবস্থা কী ও কেন ? আলোচনা করুন।
২. কর ব্যবস্থার আইনগত ভিত্তি কী ? বর্ণনা করুন।
৩. জিযিয়া কর বলতে কী বুঝায় ? বর্ণনা করুন।
৪. জিযিয়া কর একটি সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- ব্যাখ্যা করুন।
৫. কি ধরনের জরুরী অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারবে ? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আমদানী-রপ্তানী কর কী ? তার পরিমাণ নির্ধারণের পন্থা কী ? বিস্তারিত লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করার জন্য যে সকল খাত থেকে কর আদায় করা হয় তা কী কী বিস্তারিত আলোচা করুন।